ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য - ভাষা

প্রস্তাবনা :-

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয় ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তখন খুব বিশৃংখলা চলছিল । ১৭৬০ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই অরাজকতার অবস্থা খুব তীব্র আকার ধারণ করেছিল । এর মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছে, দেশে অরাজকতা, বিক্ষোভ ও ত্রাস ঘনীভূত হয়েছে — এই অবস্থায় সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল না । এই সময় এক ধারায় আবির্ভাব হয় রামমোহন, রাধাকান্ত, ভবাণীচরণ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার আর অন্য ধারায় আবির্ভাব হয় কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্র লাল, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের, এই উভয় ধারার মাঝখানে আকস্মিক জনোচ্ছ্বাসের মত আবির্ভাব হয় ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের । এ যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুই ধারার মধ্যে সেতু নির্মাণ হ'ল, একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তখন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল । বাংলা ভাষাকে তখন তিনি দর্শকের দরবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলেই মধুসূদন, বিহারীলাল ও রবীন্দ্র নাথের সাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়েছিল । ভারতচন্দ্রের পর কবিগান, টপ্পা, পাঁচালী, হাফ - আখড়াইয়ের চাপে বাংলা কবিতার মৃত্যু হ'তে বসেছিল । এই নতুন আর পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা ভাষাকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। তাই তিনি সন্ধিযুগের কবি ।

কাঁচরাপাড়ার একটি অলংকার ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত । পিতা হরিনারায়ণ দাসের তিনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন । ১২১৮ সালের ২৫ শে ফাল্গুন শুক্রবার তিনি কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চিকিৎসা ব্যাবসা ত্যাগ করে স্বগ্রামে শেয়ালদহের কুঠিতে মাসিক আট টাকা বেতনে কাজ করতেন । কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের বাসস্থান ছিল । ঈশ্বরচন্দ্র কাঁচরাপাড়া এবং জোড়াসাঁকোয় ছোটবেলা থেকেই বাস করতেন । বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত সাহসী ও দুরন্ত ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন দশবছর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় । মাতৃবিয়োগের অল্পকাল পরেই পিতা হরিনারায়ন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন । বিয়ের অল্পকাল পরেই তিনি বাড়ী না গিয়ে কার্যস্থলে গমন করেন । নববধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাড়ীতে এলে হরিনারায়নের বিমাতা তাঁকে বরণ করে-ছিলেন , এই সময় ঈশ্বর গুপ্ত একগাছা রুন বিমাতাকে লক্ষ্য করে তীব্র বেগে নিক্ষেপ করলেন কিন্তু সে রুন বিমাতাকে ত্যাগ করে কলাগাছে গিয়ে বিঁধল । অস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এক ঘরে ঢুকে সমস্তদিন দ্বাররুদ্ধ করে থাকলেন । অবশেষে জ্যেঠামশায় দ্বার ভেঙ্গে তাঁকে পাদুকা প্রহার করলেন । ঈশ্বর চন্দ্র বুঝলেন - এ সংসার মেকি , চলবার ঠাঁই - মেকির পক্ষ নিয়ে না চললে এখানে জুতা খেতে হয় । এরপর তিনি লেখনীর দ্বারা যখন তীব্র জ্বালা বিশিষ্ট বক্রোক্তি নিক্ষেপ করলেন তখন পৃথিবীর অনেক মেকি তাঁর কাছ থেকে জুতা খেল । পিতামহ এসে সান্ত্বনা দিলে তিনি উত্তর দেন – " হাঁ ; তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখছ , বাবা আমাদের তেমনি দেখবেন । " (১)

---

(১) ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) , উপক্রমণিকা , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , পৃ : ৩ ।

একবার ক'লকাতায় মাতুলালয়ে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন কলকাতা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর এবং মশা - মাছির উপদ্রব ছিল, তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করেন —

" রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়ুয়ে ক'লকেতায় আছি । "

ঈশ্বর চন্দ্রর পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। তিনি পাঠশালায় যেতে আগ্রহী ছিলেন না। কখনো পাঠশালায় যেতেন আবার কখনও টো - টো করে খেলে বেড়াতেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। পাঠশালায় ছাত্ররা যে সকল পারস্য কবিতা পাঠ করতো ঈশ্বরগুপ্ত তার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাংলা ভাষায় কবিতা শিখতেন। ছোটবেলায় তিনি লেখাপড়ায় কিছু অমনোযোগী ছিলেন তার প্রমান পাই তাঁর গদ্য রচনায়। তাঁর রচনায় দুটি অভাব পরিলক্ষিত হয় — মার্জিত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ার কি - প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবে এই ইয়ারকি আছে বলেই বাংলা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অল্প শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁর লেখায় এই ইয়ারকি লক্ষ করা যায় কারণ সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না।

বাল্যকালে যখন তিনি পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন তখন তাঁর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বালকেরা পারস্যশাস্ত্র পাঠ করতো। এই পারস্যশব্দ শুনে তিনি তার অর্থ বুঝে নিয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে কবিতা লিখেছেন। বারোয়ারী পূজার উপলক্ষে যে সকল ওস্তাদীদল আসতো কবি তাদেরচমৎকার গান প্রস্তুত করে দিতেন ।

পরে তিনি ইংরাজী শিক্ষা এবং জীবিকান্বেষনের জন্য কলকাতায় আসেন। তাঁর একজন বান্যবন্ধু যোগেন্দ্রমোহন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন – " ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কালকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রধানতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় - সঞ্চার হয়, তখন আমারও পাঠদশা। তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কান্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎ সমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যাপূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষনাৎ তাহা যাদৃশ সাধুশব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রুপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।"(২)

যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশ: কীর্তির সোপানস্বরূপ। ঠাকুর বাড়িতে মহেশের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা যুদ্ধ হতো।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। (ক) নৈতিক ও পারমার্থিক (খ) সামাজিক ও ব্যঙ্গ (গ) রসাত্মক (ঘ) যুদ্ধবিষয়ক (ঙ) ঋতুবর্ণন (চ) বিবিধ। তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে যে অভিযোগ শোনা যায় তাতে জানা যায় তিনি অশ্লীল কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতা গুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি যে সব কবিতা লিখেছেন তাঁর মধ্যে সামান্যতম অশ্লীলতার স্পর্শ নেই। তাঁকে অশ্লীল বলা হয়েছে তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতা গুলির জন্য। তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে

---

(২) ঠাকুর, যোগেন্দ্রমোহন, সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬৬ সাল।

কিছু কিছু গ্রাম্যভাষা রয়েছে । এজন্য আমরা দায়ী করতে পারি তখনকার সমাজকে , কারণ তিনি যে যুগে জন্মেছিলেন সেটা ছিল কবিওয়ালাদের যুগ । অশ্লীল ভাষাই ছিল তাদের প্রকাশের মাধ্যম । তার কারণস্বরূপ আমরা বলতে পারি এই কবিগান গাওয়া হতো সারারাত্রি ধরে । অধিক রাতে যখন শ্রোতারা ঘুমে ঢুলে পড়ত তাদের ঘুম তাড়ানোর জন্য অশ্লীল ভাষাকে কবিওয়ালারা গানের মাধ্যমে তাদের কানে পৌঁছে দিতেন । আর রসাত্মক গান শ্রবন করা মাত্রই তাদের ঘুম চলে যেতো । সারারাত ধরে এই অশ্লীল গান গাওয়া হতো । বাঙ্গালী সমাজে প্রসারিত অশ্লীলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের কিছু কথা উদ্ধৃতি করছি ।

" অশ্লীলতা বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না । যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন , তাঁহারা বাঙ্গালির রসহস্য । বাঙ্গালির গালি , নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের কোন্দল , এবং বাঙ্গালির যাত্রা , কবি , পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন । মুহূর্ত জন্য বাঙ্গালি কৃষকের কথোপকথন শ্রবন করিয়া দেখুন - বাঙ্গালির প্রনীত যে সকল কাব্যগ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত , তাহা পাঠ করিয়া দেখুন । বাঙ্গালির চরিত্রে অশ্লীলতার ন্যায় কোনো দোষই সর্বব্যাপী নহে । " (৩)

একমাত্র শহরের বাবুদের আসরে সান্ধ্যবিনোদের উপকরন হিসাবে এই কবিগানের প্রবর্তন হয়েছিল । এর পুরান ভাবের রোমন্থন ও অরুচিকর অশ্লীলতা সজনগণের শ্রবণ - পীড়াদায়ক । কবিওয়ালাদের বাগ্‌বৈদগ্ধ , যমক ও অনুপ্রাসের সুদক্ষ ব্যবহার । শ্লেষ ও

(৩) " ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ - ভূমিকা " প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছেন ।

ব্যঙ্গের ছটা যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রোতাদের বিস্ময় ও কৌতুকের উদ্রেক হয় । কবিওয়ালাদেরগানে ভাবের উদ্বেলতা ও হৃদয়াবেগ থাকতো প্রচুর পরিমানে । লৌকিক প্রেমিক - প্রেমিকার প্রেম ও বিরহ বিষয়করসগান তখনকার দিনে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল । ফলে এই রসগানগুলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়েছিল । এই কবিগণ বাক্‌চতুর ও রসজ্ঞ হতেন এবং ছন্দগ্রন্থেও বিপুন হতেন । তাই কবির লড়াই খুব উপভোগ্য হতো । কলিকাতা শহরে ধনী ও সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যবর্গের গৃহ প্রাঙ্গনে কবিগান সীমাবদ্ধ ছিল এমন কথা বলা যায় না কারণ কলিকাতার বাইরে ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগর , চুঁচুড়া , হুগলী , সপ্তগ্রাম , বীরভূম - সিউড়ীতে কবিদের আখড়া ছিল এবং কবিগান গাওয়া হতো যথেষ্ট পরিমানে । কবিগান যে শুধু ধনী বিলাসী বাবুদের পশুবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য লঘু ও উত্তেজক সাহিত্য হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল তা নয় ।

কলিকাতা শহরে ও শহরের বাইরে ধনীমানী ব্যক্তিগন লোক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । কবিগান বলতে শুধু যে অশ্লীল সাহিত্যকেই বোঝায় তা নয় । কবিগান ষড়ঙ্গ এবং অশ্লীল অংশ বা খেঁউড় এর অন্যতম অঙ্গ । দোল , দুর্গোৎসব , রাস - বারোয়ারী উপলক্ষে শুধু কলকাতা নয় , বাংলারসর্বত্র কবিগান গাওয়া হতো । কবিগান লোক সাহিত্যের অন্যতম সংস্করণ তাই লোকোৎসব , লোকসংস্কৃতি ও লোকপ্রমোদানুষ্ঠানে এর স্থান হয়েছিল । তরজা বা খেঁউড়ই এর প্রসিদ্ধির কারন । লোকসাহিত্য হলেও কবিগান কোন লঘু সাহিত্যের নিদর্শন নয় । এর মধ্যে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারার অনুশীলন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি এর ভাব ও বিষয়ের বিস্তার ও রসের গূঢ়তা ও পরিলক্ষিত হয় ।

কবিগানের উৎপত্তি যখন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল তখন সাহিত্য রচনার পরিবেশ যেমন অনুকূল ছিল না তেমনি প্রতিকূলও ছিল না । সে সময় ছিল নবাব বাদশাহদিগের রাজত্বকাল কিন্তু অন্তর্বিপ্লব লেগেই ছিল । দোল, দুর্গোৎসব, রাস-বারোয়ারী প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠানগুলি পূর্ণমাত্রায় চলতো । পূজা অর্চনা গৌন ছিল এবং আমোদ প্রমোদই মুখ্যস্থান লাভ করতো । পুতুল নাচ, সং, ভাঁড়নাচ, কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি দিনের পর দিন চলতো । পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে এর প্রসার ঘটে । কবিগান দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ঘোর বিপ্লব ও অরাজকতা দেখা দেয় ।

বাংলামঙ্গলকাব্যের শেষ যুগে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি হয় । এর উৎস বিভিন্ন পুরান, উপপুরান, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসী গান । তাই এর রূপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট দিক দেখতে পাই – যেমন, ক) সখী সংবাদ - গোষ্ঠ গৌরচন্দ্রী খ) মালসী - ডাকমালসী - লহর মালসী, আগমনী - বিজয়া, গ) তরজা ঘ) খেঁউড় ঙ) আখড়াই ও চ) বিচিত্র প্রসঙ্গ । কবিগান হল এই কয়েকটি বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত লোক সাহিত্য তাই একে বলা হয় ষড়ঙ্গ ।

অতিপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে কবির লড়াই চলে আসছে । মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাস ও দন্ডীর কবিত্বশক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে যে কথোপকথন করেছেন তাতে কবির লড়াইর কথা মনে পড়ে ।

বিবাহ , দোল , দুর্গোৎসব প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিগণ কবিগান দিতে মনস্থ করলে দুটি করে কবির দলকে নিমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হতেন , একদল চাপান দিত এবং অপরদল তা খন্ডন করতো । এই চাপান ও খন্ডনের মধ্য দিয়ে জয় পরাজয় স্থির হ'ত । এই চাপান ও খন্ডনই কবিওয়ালার লড়াই । যখন এই দুই কবির দল সন্তোপনে পরস্পর মিলিত হয়ে চাপান ও উত্তর জেনে নিতেন এবং আসরে এসে সেই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত গীতের মাধ্যমে জানাতেন সেই কবিরগানকে বলা হয় " বাধুটি " আর স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত না থাকলে সেই কবির লড়াইকে বলে উপস্থিতি ।

সেকালে হরু ঠাকুরেরসঙ্গে রামবসুর , রামবসুর সঙ্গে নীলু - রামপ্রসাদ ও এন্টনী ফিরিঙ্গীর, এন্টনী ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বকু নেড়ে , ঠাকুর সিংহ ও ভোলাময়রার , ভোলা ময়রার সঙ্গে ওলাই সরকার ও যজ্ঞেশ্বরের , মতি পসারীর সঙ্গে হোসেনের , নিতাইয়ের সঙ্গে ভবানী বেনের ও রামুর সঙ্গে রামগতির কবির লড়াই জনসাধারনের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল । এই সকল কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ভোলা ময়রা ও এন্টনী ফিরিঙ্গীর দলের কবির লড়াই জনসাধারনের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল ।

কবিগানেরচতুর্থ অঙ্গ খেঁউড়কে অশ্লীল রসগান বলা যায় । তরজায় শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবিগণ আকৃষ্ট হতেন কিন্তু খেঁউড়ে আকৃষ্ট হতেন ইতর ও কুরুচি সম্পন্ন শ্রোতারা । খেঁউড় দু প্রকার — ক) উপমা অলংকার খন্ডিত সরল খ) রূপক । লৌকিক রসগানে অশ্লীলতার বীজ দেখা দিলে তা খেঁউড় হয়ে উঠত ।

পাঁচালী ও পালাগান কবিগানের প্রাচীন পর্যায় , রামায়ণ বা মহাভারতের অংশবিশেষ যেমন — দাতা কর্ণের পালা , সীতা হরণ , জটায়ুর মৃত্যু , সীতা নির্বাসন , রাবন বধ , লক্ষন - বর্জন , সীতার পাতাল - প্রবেশ , অর্জ্জুনের লক্ষভেদ প্রভৃতি পালা বাদ্যসহযোগে গেয়ে বেড়াতেন । আবার মঙ্গল কাব্যের অংশ বিশেষ ও যেমনবিষহরির পালা , চন্ডীর ছলনা , বেহুলার খেদ , বিদ্যার বিলাপ প্রভৃতি গাওয়া হতো । এর সঙ্গে ষোড়শ সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকে সত্যপীরের পাঁচালী , দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী , ত্রিনাথের পাঁচালী , প্রভৃতির যোগ আছে । ষোড়শ - সপ্তদশ শতকে হরিসভা ও চন্ডীমন্ডপে রামায়ন ও মহাভারতের অংশ বিশেষ পাঁচালীর সুরে গাওয়া হ'ত । চন্ডীমন্ডপ বা হরিসভার কথা বললে আমরা বুঝতে পারি গ্রামে ঐ আড্ডা গড়ে ওঠার আগে ছোট ছোট আখড়াই ছিল ।

প্রাচীন বাঙলার আখড়া বলতে বোঝাত — একটি দলে ৫। ৬ জন গায়েন - বায়েন ও দোহার থাকত । আরবাদ্যযন্ত্র থাকত - মৃদঙ্গ , মন্দিরা বা করতাল , বীন , একতারা , তিতারা , সপ্তহারা , আশুরঙ্গিনী প্রভৃতি । পরবর্তীকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে আমাদের আখড়াই এর সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতোপকরন যেমন — বেহালা , কর্ণেট , ক্লারিওনেট , জলতরঙ্গ , হারমোনিয়াম , বায়া - তবলা প্রভৃতি ব্যবহৃত হ'ত ।

কবিগানের শেষ অঙ্গ বিচিত্র প্রসঙ্গ , একে কবিরা নিজেরা ভনিতা বলে থাকেন । স্বদেশ, সমাজ ও সমকালের কোন দিক নিয়ে এই ভনিতা শুরু হয় ।

কবিগানকে আমরা লোকসাহিত্য বলতে পারি তবে কবিগান বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর অনুসরন করেছে জন্য অনেকে তাকে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। গ্রাম্যসাহিত্য এবং গ্রাম্যসঙ্গীত যদি লোকসাহিত্য হয় তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুবর্তনকে আমরা নিশ্চয়ই লোকসাহিত্য বলব। আজও দেখা যায় ঢোল ও কাঁসি বাজিয়ে আসরে কবিগান গাওয়া হয়। সুতরাং এখন আর আমরা বলতে পারি না যে একমাত্র শহরের বাবুদের সাংস্কৃতিক বিলাসের উপকরন হিসাবে কবিগানের প্রবর্তন হয়েছিল। অথবা অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সাহিত্যের ধারা যখন রুদ্ধ হয়েছিল তখন এই ভাব - সংকীর্ণ ও উত্তেজক কবিগানেরউদ্ভব হয়েছিল। কবিগানের পুরান ভাবের রোমন্থন ও অরুচিকর অশ্লীলতা সজ্জনগনের শ্রবন - পীড়াদায়ক। তরজায় ও খেঁউড়ে কবিগনের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি দেশ - কালের অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর কবিগনের চতুরবিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া - হুগলী অঞ্চলে সুর সহযোগে এই গান করতে শোনা যায়।

ষড়ঙ্গ কবিগান লক্ষ করলে দেখা যায় বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য অনেক স্থান জুড়ে রয়েছে। ষড়ঙ্গের তিনটি অঙ্গ যথা — সখীসংবাদ, খেঁউড় ও আখড়াই। ভাবের দিক থেকে সখীসংবাদ ছাড়া ঝুমুরগান কীর্তনেরই অংশমাত্র, তার অনুসরন দাঁড়া - কবিগানে দেখতে পাওয়া যায়। সখী সংবাদে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন —

বলরাম - চান্দবদনী ধনী কারু অভিসার,
নব নব রঙ্গিনি রসের পসার ।।
কর্পুর চন্দন অঙ্গে বিরাজ ।
অবিরত কংকন কিঙ্কিনি বাজ ।।

মঙ্গল কাব্যের পাঁচালীর সুরই ছিল কবিগানের সমুল । পরবর্তী যুগে পাঁচালীর সুরের সঙ্গে পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত নন্দিনীর সুর, পদ, তিন, পাঠ ও তান যুক্ত হয়েছিল ।

কবির দলে মূল গায়েন থাকত একজন বা দুজন এবং দোহার থাকত দুজন বা চারজন । মূল গায়েনকে কবি বা কবিয়াল বলা হত । আর দোহারকে দোহার বলা হত । লাল চন্দ্র ও নন্দ লাল ওরফে লালুনন্দলাল ও রাসবিহারী ও নৃসিংহ ওরফে রাজু-নৃসিংহ এইরূপ একই দলের দুইজন মূলগায়েন ছিলেন । মূলগায়েন বা কবি চিতেন বা মহড়া দিয়ে কোন পালাগানের সূচনা করতেন — সুর হত পাঁচালীর সেই সুরের রেশ টেনে নিয়ে পরচিতেনের পদ সৃষ্টি করতেন । এরপর পদ ও তেন অংশ দোলন, পাড়ন ও সয়োরির দ্বারা রচিত হত । তান বলতে ফুকা ও খাদ অংশ পর্যন্ত মূল গায়েন ও দোহারা মিলে গান করতেন । ধুয়া অংশ দোহাররা নিজেরা গান করতেন এবং গায়েন তখন নীরব থাকতেন । এভাবে পালাগান, সখী সংবাদ, গৌরচন্দ্রিকা বা ভবানীবন্দনা প্রভৃতি গাওয়া হত । কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানের যে তিনটি রূপ দেখেছেন তা হল— গৌরচন্দ্রিকা, ভবানীবন্দনা ও কবির লহর । কবিগানের এই তিনটি রূপই মহড়া, চিতেন ও অন্তরা, পদাবলী কীর্তনের প্রভাব পাঁচালী গানের ওপর পড়েছিল । তাই আমরা দেখতে পাই উদ্‌গ্রাহক, আভোগ, মেলাপক, ধ্রুবপদ ও অন্তরার সঙ্গে মিলরয়েছে সুর, পদ, পাঠ, তেন ও তানের সঙ্গে ।

মহড়া — কৃষ্ণার সাধ্য কি সই,
চুরি করতে পারে চোরের ঘরে ।

* * * * * * * * * * * * *

খাদ — আমার মন বাঁধা আছে রাধার প্রেম ডোরে ।।
কৃষ্ণের সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে ।

ফুকা — ছিল সূর্পনখার বাসনা, মনে প্রেমবাসনা
তার অন্যবাসনা নাই, মনে ছিল তাই ।
দ্বাপরে সে কুব্জা হয়ে দাসী হোন কংসালয়ে
আমি তারে সদয় হয়ে মনের সাধ পুরাই ।

মেলতা — রাধার ভাবেতে ভঙ্গী বাঁকা নূতন বাঁকা
বাঁকা সখা হে ।
নাম বাঁকামদন মোহন ব্রজপুরে ।।

চিতেন — বলনে সই চোরের মন নেয় চুরি করে ।
কুব্জা নয় মনোচোর, আমার নহে অগোচর,
মিথ্যে চোর বোলে না তারে ।।

গানের কলেবর অদীর্ঘ হলে অল্প সংখ্যক গায়কের দ্বারা সম্পাদিত হত। এরূপ পুনরাবৃত্তির প্রচলনের ফলে ১ম চিতেন, ২য় চিতেন, ১ম মেলতা, ২য় মেলতা, ১ম ফুকা, ২য় ফুকা প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল ।

লহর ও ঝুমুর শব্দ দুটি কবিগানের একটি শাখার উৎপত্তির কারণ হয়েছিল। এই লহর থেকে পরবর্তীকালে কবির লড়াই বা তরজা এবং ঝুমুর থেকে টপ্পা ও ঢপ্ সঙ্গীতের প্রবর্তন

বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। টপ্ সঙ্গীত খেঁউড়ে গিয়ে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে নহরা অন্তরা অর্থে ব্যবহৃত হত। এরপর ধুয়ার পরিবর্তে ঝুমুর শব্দ দ্রুত লয় ও তাল বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। ঝুমুর দ্রুত তালের নৃত্যবাচক হিন্দী শব্দ। টপ্ সঙ্গীত ও খেঁউড় প্রায় সমার্থক শব্দ। খেতুড়ের খেয়ালি গানের আদর্শে রচিত আদিরসাত্মক গান যে কোন অর্থেই "খেঁউড় " আখ্যা লাভ করেছিল। কবির নহরের মধ্যে যে পৌরানিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকত, তার সূত্র ধরে পরবর্তী কালে যে প্রশ্নোত্তর বা বাদ প্রতিবাদের ধারা জন্মলাভ করেছিল তাই তর্জা বা (তর্জন) বা কবির লড়াই নামে পরিচিত।

সে সময় কবিগান রচনা ও গান করে অনেক কবিওয়ালা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের দলে গান বেঁধে রাম বসু অর্থ উপার্জন করতেন। এন্টনী সাহেবের সঙ্গে ভোলা ময়রার বহুবার কবিযুদ্ধ হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভোলা ময়রা বাক্‌পটুতায় জয়লাভ করেন। ভোলা ময়রা লোকপ্রিয় অশ্লীলতার পরিবেশক। শ্লেষ এবং অশ্লীলতা ব্যতীত তার কোন বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে না।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই কবির লড়াই চলে আসছিল। এই কবির লড়াইয়ের মাধ্যমেই কালিদাসের কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের পর্ব-কালেও আমরা দেখি এই কবির লড়াই প্রাচীন - ঐতিহ্যের পথ থেকে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি।

১২ বছর বয়স থেকেই ঈশ্বর গুপ্ত কবিরদলে গান রচনা করে দিতেন। "সংবাদ প্রভাকর", "সংবাদ রত্নাবলী", "প্রভাকর", "পাষণ্ডপীড়ণ", "সাধুরঞ্জন", ইত্যাদি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। "প্রবোধ প্রভাকর", "হিত প্রভাকর", "বোধেন্দু বিকাশ" গ্রন্থ তিনি পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। এ সময় তাঁকে কবি ও হাফ-আখড়াই

দলের অনুরোধে তাদের জন্য সঙ্গীত রচনা করে দিতে হত । বোধহয় ঐ কারণেই তিনি প্রাচীন কবিগানের অনুসন্ধানে ব্রতী হন । ১২৬৩ সাল হতে প্রতিমাসের১লা সংবাদ প্রভাকরের যে সংখ্যাটি বের হতো তাতে তিনি অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিগীত ও কবি-ওয়ালদের জীবনী প্রকাশ করতেন । হরুঠাকুর , রামবসু , নিতাই দাস বৈরাগী , রাসু নৃসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের গানগুলি যা আমরা হাতে পেয়েছি তার প্রায় সবই ঈশ্বরগুপ্তের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল এবং এ গুলি সংবাদ প্রভাকরেই প্রথম প্রকাশিত হয় । প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান সংগ্রহ ব্যতীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁর প্রণীত কৃষ্ণ-কীর্তন । ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং অনেক প্রাচীন কবিরলুপ্তপ্রায় রচনা প্রভাকরে প্রকাশ করে , তিনি জনসাধারনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন । ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।

ঈশ্বর গুপ্ত সখী সংবাদ বিষয়ক গান রচনা করেছেন । তাঁর রচিত কবিগান চিত্তাকর্ষক ছিল । সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বিরহ , মাথুর , মান ও মিলন বিষয়ক গান ছাড়া গোষ্ঠ বিষয়ক গান ও তিনি রচনা করেছেন ।

যেমন — ত্বরায় উঠরে ও ভাই প্রাণের বংশীধর ।

* * * * * * * *

কর্ণে শুনতে কি পাসনে এ সব গিরিধর ।

অথবা — ভানু উদয়ে নন্দালয়ে শ্রীদাম যায় ,

বলে উঠরে গোপাল , ত্বরায় লয়ে গো - পাল ,

* * * * * * * * *

সাধনে এ ধন ধরি জঠরে ।।

ঈশ্বর গুপ্তের বিরহ বিষয়ক গানে শ্লেষের সূচীমুখ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে করুণ ও কোমলতা । সর্বোপরি কবির স্বকীয় কবি প্রতিভার চিহ্ন তাঁরসকল পদেই দেখা যায় ।

কবিওয়ালাদের যুগে বাস করার জন্যই তাঁর ভাষায় অশ্লীলতার স্পর্শ লক্ষ করা যায় । সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথায় আমোদ ছিল না । চটুল ও মুখর রসিকতা ভাষার মাধ্যমে উপভোগ্য হত । যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নয় তা গালি বলে গণ্য হত না । মোট কথা তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল । পূজা পার্বন অশ্লীল , উৎসবগুলি অশ্লীল , দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার । যাত্রার সঙ অশ্লীল হলেই লোকরঞ্জন হত । পাঁচালী হাফ - আখড়াই অশ্লীলতার জন্য রচিত । ঈশ্বর গুপ্ত এই আবহাওয়ায় জীবনপ্রাপ্ত ও বর্ধিত । অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা মার্জনা করতে পারি । তাঁর এই অশ্লীলতার জন্য দায়ী — ক) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা , খ) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব , গ) সহধর্মিনী অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে একত্রে ধর্মশিক্ষা করা যায় তাঁর পবিত্র সংসর্গের অভাব , ঘ) সমাজের ওপর অত্যাচার এবং তার জন্য সমাজের ওপর কবির জাত ক্রোধ, তাঁর কবিতা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট ।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রী লোকদের প্রতি । স্ত্রী লোক তাঁর কাছে ব্যঙ্গের পাত্রী । তিনি তাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসেন , মুখ ভেঙান , গালি দেন । তিনি আরো বলেন তারা পৃথিবীর পাপের আকর এবং নানা প্রকার অশ্লীলতার মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দেন । তাঁর উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয় । প্রাচীন ঋষিদের মত মুক্ত কন্ঠে অতি কদর্য্যভাষায় ব্যবহার না করলে পুরা গালি হত মনে করতেন না ।

তিনি স্ত্রী লোকের রূপের কথা পড়লে হেসে লুটিয়ে পড়েন । মহিলাদের গৃহকর্মে আস্থা দেখে যখন সবাই বলে — " ধন্য স্বামীপুত্র সেবাব্রত ! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য । " (৪)

---

(৪) দত্ত , ভবতোষ , ঈশ্বরগুপ্ত , ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব , জিজ্ঞাসা , প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৫ , সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ পৃ : ৩০.

148888 1 OCT 2002

তখন ঈশ্বর গুপ্ত তাদের হাঁড়িশালে গিয়ে দেখবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বনেই গেল, স্বামী ভোজন করানোর সময় শ্বাশুড়ী ননদের মুন্ড ভোজন হন। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist, এই তাঁর সাম্রাজ্য এবং এতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

স্ত্রী লোকের প্রতি তাঁর এই মনোভাবের কারণ হল যে বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের হয় নি। —— শোনা যায় আকাঙ্খিত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে বিয়ে হয়েছিল গুপ্তি পাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কণ্যা দুর্গামণির সঙ্গে। তখন তিনি মন্তব্য করেন — তিনি আর সংসার করিবেন না। বাস্তবে তিনি আর সংসার করেন নি, স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন নি, তবে গৃহে রেখে তাঁর ভরণ পোষণ করেছেন এবং মৃত্যুকালে তাঁর ভরণপোষনের জন্য কিছু কাগজ রেখে গেছেন। কয়েক বছর হল দুর্গামণি দেহত্যাগ করেছেন।

যে আগুনে ভিতর থেকে শরীর পোড়ে তা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল এর প্রকাশ পাই তাঁর কবিতায়। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকলে হয়, স্ত্রী লোকের প্রতি স্নেহভক্তি থাকলে হয় তা তাঁর হয় নি। স্ত্রীলোক তাঁর কাছে ব্যঙ্গের পাত্র। তাদের প্রতি তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্ত কণ্ঠে অতি কদর্য্য ভাষা ব্যবহার করেছেন।

১২৫৪ সালে তর্কবাগীশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বিবাদ শুরু হয় এবং তা প্রবন আকার ধারণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র ' পাষন্ড - পীড়ন ' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ ভাষায় কবিতা রচনা করে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করেন। সে লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়। " রসরাজ "র ভাষা এত কদর্য্য তা অনেকেই জানে না। দেশের লোক এই কবিতাযুদ্ধে যুক্ত হয়েছিলেন। বলিহারি রুচি ! দুই পত্রের অশ্লীলতায় বিরক্ত হয়ে লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারন জন্য আইন প্রনয়ন করেন, তারপর থেকে অশ্লীলতা আর দেখা যায় না।

ঈশ্বর চন্দ্র সংসার এবং সমাজকে বাহুবলে পরাস্ত করে তার কাছ থেকে ধন, যশ, সম্মান আদায় করে নিলেন। কিন্তু অত্যাচার জনিত ক্রোধ তাঁর মিটল না। জ্যেঠামশায়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলে রেখেছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পেয়ে উত্তম-মধ্যম দিতে লাগলেন। সেকালে বাঙালীর ক্রোধ কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হতো। তাদের মনে হতো বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবাদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তারই প্রতি ব্যবহার্য্য। যে দুরাত্মা, তার জন্য এই কদর্য্য ভাষা, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা এসে পড়েছে।

কবিগান ও আখড়াই গানের প্রভাব তিনি কোনদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁর গুরুর রুচিকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন — "He was ignorant and uneducated man. He knew no language but his down; and was singularly narrow and enlightened in his views of the higher qualities he possessed none, and his work was extremely rude and uncultivated. His writtings were generally disfigured by the grossest obscenity".

---

(৫) ১৮৭১ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে Bengali Literature নামক প্রবন্ধ।

এখানে বঙ্কিম চন্দ্র সহানুভূতিহীন ভাষায় তীব্র আক্রমন করেছেন । পরে অবশ্য গুরুকে তিনি উদার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন ।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে ১৯শ শতাব্দীর প্রায় প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাঙালী রস ও রুচির দিক দিয়ে স্থূল রসের অধিকারী ছিলেন । এই সময়ের কবি ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন ভারতচন্দ্রের মানসপুত্র এবং কবিওয়ালদের প্রতিনিধিস্থানীয়, তিনি স্থূলরসেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেছেন । (৬)

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত হয় । ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মেছেন, 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বিদ্বেষপরিপূর্ণ । ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই । শত্রুতা করে তিনি কাউকে গালি দেন না । কবির লড়াই এরকম শত্রুতাশূণ্য গালাগালি, ঈশ্বরগুপ্ত 'কবির লড়াইয়ে' শিক্ষিত ছিলেন । মেকির ওপর তাঁর রাগ ছিল । মেকি বাবুরা তাঁর কাছে গান খেতেন, মেকি সাহেবরা গান খেতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা 'নস্যলোসা দধিচোসার' দল গান খেতেন । হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টান হতে চলল দেখে তাঁর রাগ সহ্য হত না । মিশনারিদিগের ধর্ম্মের মেকির ওপর বড় রাগ ছিল । মেকি পলিটিক্সের ওপর তিনি রাগ করতেন ।

ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধ সম্ভূত । অশ্লীলতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ । একে বাদ দিতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্তকে Bowdlerize করতে গিয়ে আমরা তাঁর কবিতাকে নিস্তেজ করে ফেলেছি । যদি ও আমরা জানি যে, ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নয় । প্রকৃত অশ্লীলতা বলতে আমরা বুঝি ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার্থে বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য যা লেখা হয় তা পবিত্র ভাষায় হলেও অশ্লীল ।

---

(৬) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য - পুরাতন প্রসঙ্গ , পৃ: ৭১.

আর যার উদ্দেশ্যে সেরূপ নয়, পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যার উদ্দেশ্য, তার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হলেও অশ্লীল নয়। ঋষিরা এরূপ ভাষা ব্যবহার করতেন। সেকালের বাঙ্গালীদের কাছে এটা একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোক ও কুকাজ দেখে রাগলেই "বদজোবান" আরম্ভ করতেন। তখনকার রাগপ্রকাশের ভাষা ছিল অশ্লীল। ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়েই ছিলেন অশ্লীলতায় পটু। এর মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে যিনি রাগের বশীভূত হয়ে অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা, আর যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা।

খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মপ্রভাবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বাক্যের রুচি হয়ে উঠেছিল অতিরিক্ত মার্জ্জিত। রামমোহন এদেশে এত বাদানুবাদ তর্কাতর্কি করেছেন, কিন্তু কখনও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটি কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ করেন নি। তাঁর আদর্শই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে চলছিল। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কেউ ছিল সুরাপায়ী, কেউ সাহেবদের উচ্ছিষ্ট ভোজী, কেউ স্বজাতিদ্রোহী, কেউ স্বধর্মদ্রোহী, কেউ নাস্তিক, কেউ আভিজাত্যের গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কেউ সাহেব বনে গেছে, কেউ বা ভন্ড। এই নাগর সম্প্রদায়ের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্য ইচ্ছা করেই বিশেষ করে তাদের আচার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাদের বাগ্‌ভঙ্গীর বিরুদ্ধ রুচির অনুসরণ করেছেন। খাঁটি গ্রাম্য হিন্দু বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তার ফলে তাঁর রচনায় কিছু কিছু অশ্লীলতা এসে পড়েছে।

ভন্ডদিগকে গালি দিতে তাঁর ভাষণে কপট শাসন ছিল না। তাছাড়া গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রকে পেয়েছিলেন আদর্শরূপে। এতে ধারণা জন্মে অশ্লীলতা রসসৃষ্টিরই একটা অঙ্গ।

গুপ্তকবি ইংরাজি জানতেন না - জানলেও জানতেন কাজচলা গোছের । ফলে ইংরাজি সাহিত্যের ভাবভঙ্গী বাংলা কবিতায় আনতে পারেন নি । অন্যদিকে সংস্কৃতেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল না । ফলে জটিল শব্দাড়ম্বর তার রচনায় নেই । খাঁটি বাংলা ভাষাতেই তিনি তাঁর ভাব অনুভূতির প্রকাশ করেছেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে আদর্শ বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । তিনি গুপ্তকবির রচনা-গুলিকে সংগ্রহ করে একটি রূপদান করেন তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর অশ্লীল রচনা-গুলিকে বাদ দিয়েছেন এবং নিজেই মন্তব্য করেছেন যে যুগ, কাল ও দেশ বিবেচনা করলে তাঁর রচনায় অশ্লীলতাকে ক্ষমা করা যায় ।

জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তের লঘু চাপল্য বিদ্যাসাগরের ভাল লাগে নি । বিধবা বিবাহ ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছেন ।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার প্রতি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রীতি বা শ্রদ্ধা ছিল না । তিনি গুপ্ত-কবির সম্বন্ধে অনুদার মন্তব্য করেছেন —" ময়ূরচড়া, টেরিকাটা, কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বর-গুপ্ত " ।

যুগধর্মের জন্য যে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন সেই ইংরাজী শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন । নিতান্ত স্থূল ও ভাঁড়ামিপূর্ণ কবিতা তিনি লিখেছেন । ঈশ্বরগুপ্ত অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন, এই শ্রুতিধরের শ্রুতি ইংরাজী বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় নি । অর্থ কৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান নি । ফলে বাংলা সাহিত্যের অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে । এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উক্তি — " তিনি সুশিক্ষিত হইলে তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে তাঁহার কবিত্ব, কাব্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত । আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাংলা সাহিত্য অনেকদূর অগ্রসর হইত " । (৭)

ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা ঈশ্বরগুপ্তকে প্রভাবিত করেছিল । তাঁর কাব্যে এই বিকৃতরুচি ও অশ্লীলতার ছাপ আছে প্রচুর পরিমানে । কোন কোন স্থান এমনই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যে পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণে ঐ স্থানগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিতে হয়েছে শালীনতার জন্য । এই অশ্লীলতা দোষ ও রুচিবিকৃতির পরিচয় মেলে তাঁর সামাজিক কবিতাগুলিতেই বেশী । 'বড়দিন', 'বিধবাবিবাহ', 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ও 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি কবিতা রুচিবিকৃতির চরম নিদর্শন ও সৌন্দর্যহীন অশ্লীলতার পরিচায়ক । ভারতচন্দ্রের চরম নিদর্শন ও সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় ও গীতিকাব্য সুলভ সুষমা থাকায় তাঁর অশ্লীল কবিতাগুলি সাধারণের রুচিকে আঘাত করে না । তবে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় গীতিকাব্য সুলভ সুষমা না থাকায় অধিকতর অশ্লীল মনে হয় । তাঁর কাব্যে ভাবানুতা বা সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্পর্শ মেলে না । তাঁর সমস্ত দৃষ্টি ছিল মানুষ ও সমাজের প্রতি তাতে মেলে বাহ্য - ব্যঙ্গ - কটাক্ষের পরিচয় । এই কটাক্ষ Cynical — মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয় । তিনি অনেক প্রগতিবাদী আন্দোলনকে কশাঘাত করেছেন, সংস্কার প্রচেষ্টার ওপর আঘাত হেনেছেন ।

গুপ্তকবির রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয় । তিনি ভারতচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন । তবে ভারতচন্দ্রের মত সুমার্জিত ও গাঢ়বন্ধ ভাষা, শিক্ষিত রসবোধ ও সুন্দরের প্রকাশভঙ্গী ঈশ্বরগুপ্ত বা তাঁর সমকালীন গীতরচয়িতাদের ছিল না । শব্দালঙ্কার, শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদির ঘটায় ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তকে প্রভাবিত করেছেন । গুপ্তকবি ভারতচন্দ্রকে পেয়েছিলেন আদর্শরূপে । ভাষার পারিপাট্য সাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য । গুপ্তকবির পূর্বে বঙ্গ ভাষার

---

(৭) ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে, উপক্রমণিকা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ : ৪.

কবিতাস্রোত ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই প্রবাহিত হত কিন্তু গুপ্তকবি আপনার প্রতিভাগুনে তার পরিবর্তন করেছিলেন । বাংলা ছন্দে ভারতচন্দ্রের দান অতুলনীয় , ছন্দে তিনি অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন । সংস্কৃত ছন্দেরও তিনি ব্যবহার তাঁর কাব্যে করেছেন । এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের কাছ থেকে গ্রহন করেন । ঈশ্বরগুপ্তের মনের ঝোঁক ছিল লোকসঙ্গীতের ওপর । বিশেষ করে গ্রাম্য ছড়া ও ছড়ার ছন্দের ওপর । যে সব কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের নিজস্বতার পরিচয় সবচেয়ে বেশি সেখানে লোকগীতের রীতি ও রূপ ফুটে উঠেছে । — হাপুগানে , কর্তাভজা গানে , ছেলেভুলানো ছড়ায় এর নিদর্শন মেলে । ঈশ্বরগুপ্ত অনেক শিক্ষিত সমসাময়িকের মত ভারতচন্দ্রের অনুসরনে কবিতায় আদিরসের ভিয়ান চড়ান নি । আর একথাও সত্য যে তিনি কবি ও কবিতার বিচারে মুড়ি - মিছরীর তফাৎ করতে পারেন নি । পানিনির মতই যেন একসূত্রে " শ্বানং যুবানাং মঘবানমাহ " । ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায় রামপ্রসাদ - ভারতচন্দ্রের দুটি লক্ষন প্রচুর পরিমানে দেখি - একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার এবং অপরটি খাঁটি বাংলা বাক্-রীতির ব্যবহার । একথা সত্য যে ঈশ্বরগুপ্ত রসিকতার ভঙ্গীটি কবিওয়ালাদের থেকে পেলেও এবং তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমা ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেও এসব কবিতায় তাঁর এমন একটি " স্যাটিচুড" বা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁর নিজস্ব । তাঁর কবিতায় আমরা পাই তাঁর নিরাভরন ভাষা ও সহজ প্রকাশরীতি । ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা যেন সদ্য খনি থেকে তোলা সোনা । তাঁর কবিতা পাঠ করলে মনে হয় কবি যেন পাঠকের সঙ্গে একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাঠককে দুকথা শুনিয়েছেন । এটি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার বৈশিষ্ট্য আর মনে হয় কবি এটি পেয়েছেন কবিওয়ালাদের কাছ থেকে ।

আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী লেখক আমরা প্রথম দেখলাম ঈশ্বরগুপ্তকে । ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অধিকাংশ কবিই ছিলেন আভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর আদর্শে লালিত ধনী , পৃষ্ঠপোষকদের মুখ চাওয়া সংস্কৃতিবান পরিষদ বিশেষ । ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের পর মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ গড়ে উঠতে লাগলো সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়া ও আওতার বাইরে ।

তাদের মধ্য থেকে যে সব কবি বা সাহিত্যিক বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণ শিক্ষিত জন-সাধারনের পৃষ্ঠপোষকতার ওপরঅধিকতর নির্ভরশীল হলেন । এমনি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত কবি ঈশ্বরগুপ্ত । তাঁকে অভিজাতের মুখাপেক্ষী হয়ে লেখনী ধরতে হয় নি বলে স্বাধীন চিন্তা তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন । এখানেই তাঁর মধ্যে নতুনযুগের নিশানা দেখা গেল । ভারত-চন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের এখানেই পার্থক্য আর তার জন্য দায়ী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। ঈশ্বরগুপ্তকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত সামন্তরাজের অনুরোধে লেখনী ধারণ করতে হয় নি । তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি । সমাজের দোষ ত্রুটিকে তিনি ক্ষমা করেন নি , পরিহাসের সঙ্গে তার সমালোচনা করেছেন । কৃত্রিমতার মুখোশ খুলে তাকে খাঁটি স্বদেশী ও সামাজিক করতে চেয়েছেন ।

অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরুতে যে কাব্য - রচনা করেন , তার পিছনে তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান ছিল । মধুসূদন ছাড়া তাঁর সমকালের কবি সমাজের রচনায় কম বেশী তাঁর প্রভাব স্পষ্টতেই লক্ষ্য করা যায় ।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে বাঙালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী । একথা ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও বলেছেন । তিনি একাজে কেন লিপ্ত হলেন তার কারন স্বরূপ বলেছেন যে এসব গান লুপ্ত হতে চলেছিল বলেই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন । আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঈশ্বরগুপ্ত নিজে বাংলার এই সাহিত্যধারারই কবি । একথা মানতেই হবে যে সেকালে তাঁর সমসাময়িক আর কেউ ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের কাব্যের মর্মে প্রবেশ করতে পারেন নি । তাই প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কবি জীবনকে রক্ষা করার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা তাঁর ছিল । এই ধরনের ইতিহাসবোধ ঈশ্বরগুপ্তের এই উদ্যমের মূলে ছিল । কবির কবিত্ব বুঝে লাভ আছে সন্দেহ নেই , কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝতে পারলে

গুরুতর লাভ । কবিতা দর্পন মাত্র - তার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে । এই দর্পণ বুঝে আমাদের লাভ নেই । আমাদের বুঝতে হবে এই দর্পণের কাঠামোকে অর্থাৎ তাঁর কবিতার ভাষাকে ।

ঈশ্বরগুপ্তের সম্পর্কে নানা মন্তব্য শুনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য গুরু ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন যে সমাজের সঙ্গে যোগ না থাকায় পরিশীলিত রুচি ও সাহিত্যবোধ তাঁর গড়ে উঠতে পারে নি ।

কিন্তু এই প্রচলিত ধারনা কি সর্বাংশে সত্য ? এই জিজ্ঞাসা থেকেই বর্তমান গবেষণার চিন্তা মাথায় এসেছে । আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি কর্তব্য করার জন্য তাঁর মৃত্যুর পর কবিতাগুলোকে সংকলন করে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন । এর মধ্যে অন্যতম ভাগ হ'ল সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতা । কিন্তু তিনি এ ধরনের কবিতাকে প্রথমে স্থান দেন নি । প্রথমে স্থান দিয়েছেন পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতাকে। এ রকম নির্বাচন তিনি ইচ্ছা করেই করেছেন । তিনি জানতেন তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট । বাকি কবিতায় এই গ্রাম্যতার স্পর্শ নেই । তাই গ্রন্থাকারে রূপ দেবার সময় তিনি প্রথমে স্থান দিলেন নৈতিক ও পারমার্থিক পর্যায়ের কবিতাগুলোকে । সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাকে কেন্দ্র করে তাঁকে অশ্লীল কবি বলা যাবে না । কারণ অংশকে নিয়ে সমগ্রকে বিচার করা যায় না ।

সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ভাষা অশ্লীল , — এ অতি সরলীকৃত উক্তি । এই উক্তি খন্ডন করার জন্যই তাঁর কাব্য ভাষার বিশ্লেষণ অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে ।

ঈশ্বরগুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনা । ভাষা কোথাও তুবড়ির মত ফুটছে — আর চারদিকে ফুল কাটছে । কোথাও আবার ভাদ্রের মরা গঙ্গার মত ছুটছে , আর তার

ওপর কত পাল তোলা তরী চলছে । কোথাও আবার বসন্ত লতার মত দুলছে, কোথাও আবার ঝড় - বাদলের মত শিল পড়ছে । তাঁর ভাষা দুরন্ত বালকের মত - ঠাকুরদাদাকে একটি চড় মেরে, ঠাকুরনদিদির দিকে মুখভঙ্গী করে নাচতে নাচতে ফিরে আসে, ভাষা বড় দুরন্ত ।

ঈশ্বরচন্দ্র ব্যঙ্গ বিশারদ, রহস্যে রসরাজ — সেই জীবন্ত দুরন্ত ভাষা, আর সেই রঙ বেরঙের ব্যঙ্গ, বাসর ঘরের বুড়ি ঠাকরুনদিদির মত সে এক টক্কই স্বতন্ত্র । তার মধ্যে অশ্লীল আছে, অশ্লীল আছে, বঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে, হাসি আছে, খুশি আছে, উপদেশ আছে, নির্দেশ আছে, কুন্দন আছে, ক্রন্দন আছে, তাতে হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই, নাকাশিটানি নেই, চোখটাটানি নেই, অন্তরে অন্তর্দাহ নেই । ঈশ্বরগুপ্তের রাগ — ভোলানাথের খোলা কথা তুষের আগুনের মত সে রাগ কখন গুমরে গুমরে থাকে না । ঈশ্বর - গুপ্তের ব্যঙ্গ, ইয়ারের রঙ্গ, তাতে দ্বেষের লেশ নেই ।

ভাষার রূপচ্ছটায় তিনি গরীয়সী এবং অলঙ্কারের ঘটায়ও তিনি বলীয়ান । এই ভাষা এবং অলঙ্কারের প্রাচুর্যে তাঁর কবিতার ভাব বিলীন হয়ে গিয়েছে । এটিই তাঁর কাব্যের প্রধান দোষ । তাঁর কবিতা পাঠ করতে করতে হঠাৎ যেন মনে হয় ভাষা ও ছন্দের একটা ঝড় যেন কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে বয়ে গেল । অথচ যেখানে তিনি সচেতন থেকেছেন সেখানে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে রসময়ী ।

যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখেছেন এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেউ গদ্য বা পদ্য লেখেন নি । তাতে সংস্কৃত জনিত কোন বিকার নেই, ইংরাজী নবিশীর বিকার নেই । পান্ডিত্যের অভিমান নেই, বিশুদ্ধির বড়াই নেই । ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না - সরল, সোজা পথে চলে গিয়ে পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে ।

এমন বাঙালীর বাঙালা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেউ লেখেন নি - আর লেখার সম্ভাবনাও নেই। কেবল ভাষা নয় — ভাবও তাই। ঈশ্বরগুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নেই।

গোপালবাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখেছেন। আমরা যা পেয়েছি তা তার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

সাধারণ পাঠক তাঁকে অশ্লীল কবি হিসেবে জানেন। তাঁর কাব্যকে বিশ্লেষণ না করলে তাঁর কবিতাকে শ্রেণী বিভাগ করা যাবে না। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তাঁর কাব্য ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তিনি যে অশ্লীল কবি নন তা প্রমান করবো। এই গবেষণার প্রকল্প হবে তাঁর পুনর্মূল্যায়ন করা। যুগসন্ধির কবি হিসেবে তাকে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন কিন্তু তাঁর ভাষাকে নিয়ে কেউ আলোচনা করেন নি।

একদিকে আমি দেখতে চেষ্টা করব — ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা কাব্যের ভাষার ঐতিহ্যকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে কি ভাবে তিনি এই পুরানো কাঠামোর ওপর নতুন কাব্য - ভাষার আদল গড়ে তুলেছেন। সমগ্র আলোচনা এর ওপরই বিধৃত হবে এবং এ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।